অচিন রাগিণী

অচিন রাগিণী

সতীনাথ ভাদুড়ী

KOBI PROKASHANI

অচিন রাগিণী
সতীনাথ ভাদুড়ী

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Achin Ragini by Satinath Bhaduri Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: May 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98947-6-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

পিলে, নতুনদিদিমা আর তুলসী, তিনজনকে নিয়ে এই 'টান-ভালোবাসা'র গল্প। শোনা পিলের মুখে।

এখনও নতুনদিদিমার কথা বলবার সময় সে একেবারে গদ্‌গদ্‌ হ'য়ে ওঠে।

...কী সুন্দর কথা বলতে পারতেন তিনি! 'টান-ভালোবাসা' কথাটি যে তাঁরই সৃষ্টি। লেখাপড়া-না-জানা কোনো গ্রাম্য মহিলা যদি এইরকম সব অদ্ভুত ভালো কথা না ভেবে-চিন্তে যখন তখন বলে যেতে পারেন, তাহলে পিলে অবাক না হয়ে পারে না।

আগে তার নাম ছিল খোকা। তারপর তুলসী তার নাম দিল পিলে। এই নতুন নামকরণের দিনটি বেশ মনে আছে।...ঘুঁটে-পক্ক পোরের ভাত ছাড়া আর কোনো জিনিস খাওয়ার অনুমতি দেননি গণেশ কবিরাজ। গরুর চোনার সেঁক, হিং দিয়ে অড়রপাতার রস, শিউলিপাতর বড়ি ও গুলঞ্চের পাঁচনের দৌরাত্ম্যে জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। পিসিমার নজর এড়িয়ে রোদ্দুরে বেরুবার উপায় নেই। তিনি ভাঁড়ারঘরের বারান্দায় আমসত্ত্ব দিচ্ছেন, রোগীর ঘরের বারান্দায় দিতে ভরসা পান না। মাঝে মাঝে তাঁর হাঁক শোনা যাচ্ছে : 'ওরে ঘুমুস না; খেয়ে-দেয়ে ঘুমুলেই জ্বর আসবে। কানদোমড়ানো খাতাখানা নিয়ে বোস না কেন কিছুক্ষণ।' বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে 'সায়ান্টিস্ট' করাবেন। পিলে তখন সবে লিখতে শিখেছে। তখন থেকেই বাবার হুকুম, কবে কোথায় কোন ফল, ফুল, জানোয়ার, পাখি, সে দেখে, সব একখানা খাতায় যেন লিখে রাখে। কোনো কোনো রবিবারে বাবার হঠাৎ মনে হয় যে ছেলেকে উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়ায় তাঁর দিক থেকে গাফিলতি হচ্ছে। অমনি খাতাসুদ্ধ পিলের ডাক পড়ে। সেইখানাই পিসিমার উল্লিখিত কানদোমড়ানো খাতা। পিসিমার কথাতে পিলের খেয়াল হলো যে খাতা লেখা অনেকদিন বাদ পড়েছে। অনেক দিনের মিথ্যা তারিখ দিয়ে সেগুলোকে লিখে ফেলা দরকার। বাবাটার আবার যা মুখস্থ! গত মাসে, সে লিখেছিল খঞ্জন পাখি দেখেছে। বাবা ধরে ফেলেছিলেন। 'খঞ্জন পাখি তো আসে শীতের প্রথমে। তুই বৈশাখ মাসে দেখলি কী করে?' অভিজ্ঞতায় পিলের সড়গড় হয়ে এসেছে কোন কোন জিনিস লিখলে বিপদ নেই। 'শুক্রবারে ঠিকেদারবাবুর বাগানে একটি মোচা দেখিয়াছি।' শনিবারে কাক না শালিক কী দেওয়া যায় সেই কথা ভাবতে ভাবতে পিলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।...যে ডাইনিবুড়িরা গভীর জঙ্গলের কুটিরে ছেলে-পিলেদের বন্ধ করে রেখে দেয়, তাদেরই কেউ হয়তো এ বাড়িতে পিসিমা সেজে এসে আমসত্ত্ব দিচ্ছে।...

পিলে বাগানের দিক্‌কার জানালা খুলে দিল—লাগুক রোদ্দুরের ঝাঁজ। রোদ লাগিয়ে হোক তার জ্বর। বেশ হবে! খুব হবে পিসিমার।...বাগানের পাঁচিলের ওপারে ও কে? তুলসী না? ঐ তো কাঁধের ওপর পোষা বেজিটা বসে। তুলসী পাঁচিল টপকে এই দিকেই আসছে পা টিপে টিপে। গাছতলার শুকনো পাতাগুলোর ওপর আলগোছে পা না ফেললে বড় শব্দ হয়। সে পিলেকে জানালায় দেখেছে; কিন্তু কে জানে—ঘরের ভিতরে পিসিমারা থাকতেও পারেন—অনর্থক এই রোগা ছেলেটাকে বকুনি খাইয়ে লাভ কী! চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল—চলে আয় জানালার কাছে; ঘরে কেউ নেই। তুলসীর গড়ন ছিপছিপে। কালো রঙের মধ্যে বেশ একটা চকচকে ভাব। অস্পষ্ট গুটিকয়েক বসন্তের দাগ সত্ত্বেও মুখখানি বেশ মিষ্টি—বোধ হয় তার চোখদুটির জন্য। মুখের দাগ কয়টি বোধ হয় তার গর্বের জিনিস; কেননা, তাকে কেউ যখনই জিজ্ঞাসা করে যে তার বসন্ত হয়েছিল কি না—সে নিশ্চয়ই জবাব দেবে 'হ্যাঁ। মিক্স।' এই ইংরেজি শব্দটির মানে তখন তাদের কেউই জানত না; বহুদিন পরে বুঝেছিল যে মিক্স মানে জলবসন্ত আর আসল বসন্ত মেশানো। শোনা ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের ওপর একটা প্রবণতা তুলসীর ছোটবেলা থেকেই; আর কোনো বিষয়ে একবার মত স্থির করে ফেললে তার পক্ষে সেটা বদলানো শক্ত, সেই তখন থেকেই।

তুলসী এসে দাঁড়িয়েছে জানালার বাইরে হাসতে হাসতে। বেজিটাকে এক চাঁটি মেরে বলে, 'এই শালা! টেরি নষ্ট করে দিস না! এইটাকে নিয়েই হয়েছে মুশকিল। দেখছিস না—আমি পা টিপে টিপে এলে কী হয়, শালিক পাখিগুলোর কিচিরমিচির বন্ধ হবে না, যতক্ষণ এটাকে দেখতে পাবে! কত ছোট এই আমটা দেখেছিস। টিপলে পুচ করে আঁঠি বেরিয়ে আসে। ঠিকেদারবাবুদের বাগান থেকে পেড়ে আনলাম জমুরত আম—তোর জন্য। নে, চট্ করে খেয়ে ফেল্!' কবিরাজ আম খেতে বারণ করেছে, কিন্তু শুধু সেজন্য নয়। পিলের আসল ভয় পিসিমাকে। জানতে পারলে আর আস্ত রাখবে না। তাই সে মৃদু আপত্তি জানায়—'গণেশ কবিরাজ বলেছে যে, আমার পেটজোড়া পিলে।'

'কে? ঐ পেটরোগা মিস্টার গন্‌সন্ কবরেজ? পিলেতে ভরা বলে কি তোর পেটে আর এই পুচকে আমরা আঁটবার জায়গা নেই? কী যে বলিস! তুই সত্যিই একটা আস্ত পিলে;—ছেলে না। পিলে গলানোর হজমিপাচক হচ্ছে আম। ঐ কবরেজের বউ মিসেস গন্‌সন্ সেদিন শিউলিপাতার না কিসের যেন বড়ি শুকোতে দিয়েছিল। তাই খেয়ে ফুদি মিস্ত্রির ছাগলটা ব্যা ব্যা করতে করতে মরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে। মাইরি বলছি। ওর আবার ওষুধ!'

তার শ্লেষে নয়, লোভে পড়েই পিলে আমটা খেল। হাতমুখ ধুতে গেলে এখনই ধরা পড়ে যাবে পিসিমার কাছে।

'এই নে, মুছে ফেল আমার জামায়! আমি তো এমন হলে বেজির গায়ের বুরুশে মুখ মুছতাম। তোর আবার যেমন আটাশেপনা! তোকে এবার থেকে পিলে বলে ডাকব। আবার কাল আসব—ঠিক এই সময়। বুঝলি!'

ভালো না লাগলেও তুলসীর দেওয়া নামের কেউ প্রতিবাদ করে না কোনোদিন। এর চেয়েও খারাপ নাম যে ও পিলের দেয়নি সেই যথেষ্ট। ঐ তো নবীন সেকরার হাড়জিলজিলে ছেলেটাকে তুলসী 'মড়া' বলে ডাকত। এখন সকলেই তাকে ঐ নামেই ডাকে।

সেই থেকে নিজেদের বাড়ির বাইরে খোকার নাম হয়ে গেল পিলে।

সে বয়সে কারও সঙ্গে হৃদ্যতা এক নাগাড়ে বেশিদিন টেকে না। কিছুদিন দিদিকেই খুব ভাল লাগে, কিছুদিন তুলসীকে, কিছুদিন মিস্ত্রিদের ছেলেটাকে, কিছুদিন নতুন দিদিমাকে, কিছুদিন নিতুদার কনে বউকে। যখন থাকে তখন মনে হয়, এ ভালো লাগা চিরস্থায়ী; কিন্তু কবে থেকে যেন একজনের বদলে আর একজনকে ভালো লাগা অভ্যাস হয়ে যায়। খেলার বেলাতেও যেমন হয় না? কখনো লাটিম, কখনো মার্বেল, কখনো ডাণ্ডাগুলির ওপর ঝোঁক? এও সেই রকম। এর আগেও নতুনদিদিমা আর তুলসীকে ভালো লাগার ঝোঁক বার-কয়েক এসেছে গিয়েছে। নতুনদিদিমাকে ভালো লেগেছে—সেই অনেক ছোটবেলায়, দিদির সঙ্গে যখন তাঁদের বাড়ির উঠোনে রোজ খেলা করতে যেত। দিদি বড় হয়ে যাবার পর গত দুই তিন বছর থেকে আর খেলতে যায় না। তাই পিলেরও সেখানে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়, মনে রাখবার মতো একটি ঘটনার দিন থেকে সাময়িক ঝোঁকের পরিবর্তে একরকম স্থায়ী আকর্ষণ গড়ে উঠতে আরম্ভ করে পিলের অন্তরের গভীরে।

পিলের অসুখ তখন একেবারে সেরে গিয়েছে। তুলসীর ওপর অগাধ বিশ্বাস।

'পিলে, নুন এনেছিস?'

'আনি আবার নি।'

তুলসী বলেছে নুন দিয়ে পাকাকলা খেতে 'ফাইন' লাগে। কাজেই তাদের সকলেরই, ফাইন লাগে, মাইরি!

জায়গা বাছতে তাদের ভুল হয়েছিল। ঠিকেদারবাবুর পশ্চিমবাগানের পিছনে পুরনো ইটের পাঁজার আড়ালে সবে কলা খাওয়া আরম্ভ করেছে সকলে, এমন সময় জনকয়েক, মিস্ত্রি-মজুর এসে হাজির সেখানে। এরা ঠিকেদারবাবুর জমিতেই ঘর বেঁধে থাকে। আজ যে হঠাৎ তাঁর ইঁদারার পাড় বাঁধানোর জন্য এই সাপের আড্ডা পাঁজাটার থেকে ইটের দরকার পড়বে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। জনমজুররাও প্রথমটায় ছেলেদের এখানে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর একসঙ্গে সবাই উল্লসিত হয়ে ওঠে।

'তাই বল! এইগুলোরই কাজ তাহলে! নিত্যি কলা চুরি! নিত্যি কলা চুরি ঠিকেদারবাবুর বাগান থেকে! আর আমরা এখানে থাকি বলে আমাদেরই ওপর দোষ পড়ে! গত সপ্তাহেও ঠিকেদারবাবু আমাদের চোর বলে গালাগালি করেছেন!'...

'এ কি ঠিকেদারবাবুর বাগানের কলা নাকি? বললেই হলো!'

কে তাদের প্রতিবাদ শুনছে! মিস্ত্রিরা কানেও তোলে না এ কথা। পালাতে পারে পিলেরা; কিন্তু তা হলে দোষ প্রমাণ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, সুরকিকোটা বুড়ি ভিখুয়ার মা আর ভখুরন মিস্ত্রি সকলকেই চেনে; পালিয়ে লাভ নেই। ছেলেরা সকলে চুপ করে আছে; কারণ সকলেই জানে যে, যা করবার তা তুলসীই করবে। কলা চুরি নিয়ে একটা হইচই না হয় এ সম্বন্ধে পিলেরই স্বার্থ সবচেয়ে বেশি। আর কারও বাড়িতে শাসনের বালাই নেই। এদের মধ্যে তুলসী আর পিলেই হচ্ছে পাড়ার ছেলে। বাকি সকলে পড়ে 'বাজারের ছেলে'র পর্যায়ে। তাদের নাকি ছিল 'যত সব বাজারি অসভ্যতা'। তাই তাদের সঙ্গে পাড়ার বড়দের সম্মুখে, মেশা বারণ।

'কিছু বলিস না এদের, তুলসী!' পিলে কাতর মিনতি জানায়।

'সে আর আমাকে বলে দিতে হবে না। তোকে নিয়েই তো যত ভাবনা! নইলে দিতাম য়্যাসা এক 'য়ুনিভার্সাল'এর বাড়ি ভখুরনটার মাথায়...'

তুলসীর কাছে সব সময় থাকে একটি রেলের চাবি, একখানি রুমালের সাইজের 'ইউনিয়ন জ্যাক'-এর সঙ্গে বাঁধা। এই চাবিটির নাম তুলসীর ভাষায় 'ইউনিভার্সাল'। রাজার অভিষেক উপলক্ষ্যে প্রাইমারি স্কুলে যে সারি সারি নিশান টাঙানো হয়েছিল, তারই একখানা নিয়ে সে রুমাল করেছে।

পিলেকে নিয়েই ভাবনা; নইলে তুলসী করবে এদের ভয়! সে বলে 'হাওয়াগাড়ি' সিগারেটের ধোঁয়া নাক দিয়ে বার করেছিল একদিন! হাতের কাছে এত ইট,...আচ্ছা মারামারির কথা না-হয় বাদই দেওয়া গেল...যা চমৎকার হিন্দি বলে, হিন্দুস্থানি গালাগালি দিয়ে এখনই এদের ভূত ছাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে হুকুম করল ভখুরন মিস্ত্রিকে।

'নে! তাকাচ্ছিস কী ড্যাব ড্যাব করে! তুলে নে কলার কাঁদিটা! চল কোথায় যেতে হবে!'

চুরি করলে কী হয়। বাবুভাইয়াদের বাড়ির ছেলে; হুকুম করতেই পারে। ভখুরন মিস্ত্রি কলার কাঁদিটা হাতে করে নেয়। সে-ই চলে সবচেয়ে আগে আগে। ইটের বোঝা মাথায় বীরের দলের সঙ্গে, বন্দিদের মিছিল গিয়ে ঢোকে ঠিকেদারবাবুর বাড়ির উঠোনে।

'মাইজি কোথায়!'

বামাল চোর ধরতে পারলে বোবার মুখেও কথা ফোটে। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে ভখুরন মিস্ত্রি। মাইজি কুলোয় করে কী যেন ঝাড়ছিলেন ভাঁড়ারঘরে। বেরিয়ে এলেন। কালাপেড়ে আধময়লা শাড়ি পরনে।

'দাঁড়া, আজ তোদের মজা বার করছি!...বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান। এবার পড়েছ বামুনের ব্যাটারা দেখনঠাকরুনের পাল্লায়! চেনো না তো আমাকে! এমনি দেখনঠাকরুন কিছু বলে না তো বলে না; কিন্তু যখন বলে তখন একেবার বুঝিয়ে ছাড়ে। ভদ্দর লোকের বাড়ির ছেলের এই কাজ! ছি ছি ছি ছি! আছে তো সব জিনিসেরই একটা...'

তুলসী আর চুপ করে থাকতে পারে না।

'এ কলায় আপনাদের বাড়ির নাম লেখা আছে নাকি?'

'তুই-ই বুঝি পালের গোদা? কলায় আবার নাম লেখা থাকে নাকি?'

'চলুন আপনাদের কলাবাগানে; কাঁদি মেপে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এ কলা আপনাদের বাগানের না।'

'ওরে আমার মেপে দেখানেওলা রে! সে গাছের থোড়ের কবে ছেঁচকি খাওয়া হয়ে গিয়েছে; আজ এসেছেন গাছ মিলিয়ে দেখাতে!'

সকলেই বুঝতে পারছে যে, তুলসী এখানে জুত করতে পারছে না।

'আপনারা থোড়ছেঁচকি খেয়েছেন বলে কি আমরা চোর হয়ে যাব? আবদার!'

দেখনঠাকরুন এ কথায় কান না দিয়ে 'বাজারের' ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—'তোরা কে রে? চিনতে পারলাম না তো ঠিক। কী নাম বললি? মড়া? কী নামের ছিরি! 'বাজারের'? সেকরাদের বাড়ির ছেলে তোরা সব? তোরা আবার এ পাড়ায় এসে জুটেছিস কেন? পালা! চ'লে যা আমার সমুখ থেকে এখনই! নিয়ে যা তোদের এঁটো কলার কাঁদি! মিস্ত্রি তোরা এখানে হাঁ করে কী দেখছিস তখন থেকে! কাজে ফাঁকি দিতে পারলে হলো!'

ভখুরন মিস্ত্রির দল লজ্জিত হয়ে ইঁদারাতলায় কাজ করতে চলে যায়।

যাক, ব্যাপারটা আজ তাহলে অল্পের ওপর দিয়ে গেল। পিলে আর তুলসীও 'বাজারের' ছেলেদের পিছনে পিছনে দরজার দিকে যাচ্ছে।

'বামুনের ব্যাটাদের যেতে বলেছে কে? বড় যে গুটি গুটি এগনো হচ্ছে!'

তুলসীকে আর ঠেকানো গেল না। সে রুখে দাঁড়িয়েছে।

'বাপ তুলে কথা বলবেন না বলছি! আমাদের বলতে এসেছেন বামুনের ব্যাটা! আপনারা কী? জানি না ভেবেছেন? সদ্‌গোপ হয়েও ভোজকাজের সময় নিজেদের কায়স্থ বলে চালান সে খবর আমরা রাখি না ভেবেছেন? সদ্‌গোপরা তো ভালো লোক। আমি আপনাকে বলি বদ্‌গোপ। বুঝেছেন—বদ্‌গোপ!'

এত খবরও রাখে তুলসী। বাংলার বাইরে মানুষ তারা। এখানে সে বয়সে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে বামুন নয় তাকেই কায়স্থ বলে ধরা হতো। অপরের এঁটো পেয়ারা খাওয়ার সময়, এই জাতিবিভাগের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হতো। বামুনের ছেলেরই এই ব্যবস্থায় লোকসান। সুতরাং বামুনের ছেলে হয়ে জন্মানোর জন্য নিজেকে ধিক্কার না দিয়ে উপায় ছিল না।

এতক্ষণ একটা হাসির বিজলী ঝিলিক মারছিল দেখনঠাকরুনের চোখে। বদ্‌গোপ! এইবার সত্যি হেসে ফেলেছেন তিনি। সে হাসি আর থামতে চায় না। তুলসীর মুখ দেখে বোঝা যায় যে, সে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

'বেশ কথা বলতে শিখেছিস তো। দাঁড়া, তোকে আমি পিটোই।'

হাসতে হাসতে তিনি এগিয়ে এসে তুলসীর মাথাটি নিজের দিকে টেনে নিলেন। কনুই-এর উপরের নরম জায়গাটিতে তাঁর চারটি আঙুল চেপে বসেছে...বুড়ো আঙুলটি দেখা যাচ্ছে না। ফাঁক করা ঠোঁট দুটির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছেন; আর তারই মধ্যে দিয়ে একটা অর্থহীন স্বর বেরুচ্ছে—হি-ই-ই-ই-ই...।

এই হচ্ছে দেখনঠাকরুনের আদরের নিজস্ব রূপ। পরে এ জিনিস পিলে বহুবার দেখেছে। ছোটবেলা থেকে রোগে ভুগত বলেই বোধ হয়, একটু দূর থেকে পরিবেশের খুঁটিনাটিগুলো দেখবার, মনে রাখবার ও তা নিয়ে জাবর কাটবার একটা সহজ ক্ষমতা জন্মে গিয়েছিল পিলের।

'তোর গা-টা তো খুব মোলায়েম রে!'

তুলসীর গা যে খুব মোলায়েম, তা পিলে এর আগে জানত না। দেখনঠাকরুনের কথায় এখন লক্ষ করে দেখে। সত্যিই তো! বেশ তেলা তেলা। নতুন জুতোর মতো। এইজন্যই কি তুলসীকে ছারপোকা কামড়ায় না? একদিন একখান চেয়ারে অনেকক্ষণ বসে দেখিয়ে দিয়েছিল। আর কেউ পারেনি। সেদিন সবাই ঠিক করেছিল যে, তুলসীর রক্ত তেতো। দূর! তা কেন হতে যাবে! তেতো ওষুধ খেল পিলে; আর রক্ত তেতো হয়ে যাবে তুলসীর? এতদিনে পিলে বুঝেছে ব্যাপারটা। তেলা গা বলে ছারপোকার কামড় পিছলে যায়। নিজের গায়ের চামড়াও পিলে একবার দেখে নিল আড়চোখে। তুলসীর মতো নয়;—অন্য রকম। তবু যদি দেখনঠাকরুন বলেন যে, তার গা-টাও বেশ মোলায়েম, তা হলে খুব ভালো লাগবে তার। জিজ্ঞাসা করবে নাকি—'আর আমার গা-টা?' ধেৎ! তা কি জিজ্ঞাসা করা যায়! পিসিমা টিসিমা হলেও না হয় হতো।

তুলসী জোর করে মাথাটা ছাড়িয়ে নেয়; পিলের সমুখে বোধ হয় লজ্জা লজ্জা করছিল। ঠোঁটের কোণের নির্গতপ্রায় লালা টেনে নিয়ে দেখনঠাকরুন ঢোক গিললেন।

'আচ্ছা, আপাতত ঐ বালতির জলে পা ধুয়ে আসুন বামুনঠাকুর। বামুনঠাকুর তো আমার বামুনঠাকুরই!' তারপর পিলেকে বললেন, 'ওরে, ও সংক্রান্তির বামুন! তোকেও কি আপনি বলতে হবে নাকি রে? কী, কথা বলছিস না যে বড়? হাসি বেরিয়েছে দেখি এতক্ষণে মুখে। যা, হাত-পা ধুয়ে আয়! ছিষ্টি সাত মুল্লুক ঘুরে বেড়াচ্ছে! ঐ পা না ধুয়ে আমি ভাঁড়ারঘরের বারান্দায় উঠতে দিই! আমি বরঞ্চ

দেখি ভাঁড়ারঘরে কিছু আছে টাছে নাকি। লেজওয়ালা বামুনঠাকুরের কলা খাওয়া বন্ধ করেছি আজ...'

'দেখুন, বার বার বামুনঠাকুর বামুনঠাকুর বলে ঠাট্টা করবেন না বলছি!'

'কী বলব আপনাকে তা তাহলে বলে দেন দয়া করে। বামুনের ব্যাটা বলব না, বামুনঠাকুর বলব না, তবে কি বদমামুন বলব?

আবার সেই হাসি। দেখনঠাকরুনের হাসি যত বাড়ে তত তুলসীর চোখ ছলছল করে।

'ওকি! রেকাবের ওপর মুখ গুঁজে বসে রইলি! খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। দেখ তো বেলা পড়ে এলো। আমার কি আজ খাওয়া-দাওয়া নেই নাকি? তোকে আবার ছুঁয়ে ফেললাম—কাপড় ছাড়তে হবে। তুই চটিস, কিন্তু তোকে কী বলে যে ডাকি সে-ই হয়েছে মুশকিল। তোর নাম যে আমার শ্বশুরেরও নাম। তাই জন্যেই যে আমি ঠাকুরদেবতার গন্ধপাতার নাম নিতে পারি না। আচ্ছা, তোকে গন্ধপাতা বলেই ডাকব এবার থেকে। আর যদি গন্ধবামুন বলি, তাহলে কেমন হয়? আবার হাসি হচ্ছে! হাসি! দেখ তো হাসলে পরে কী সুন্দর দেখতে লাগে। তা নয়, রেগে হুম্-ম্-ম্! যা দুচক্ষে দেখতে পারি না!'

এরপর তুলসীর হাবভাব সহজ হয়ে আসতে আর দেরি হয় না। পিলে এই ফাঁকে কাজের কথা পাড়ে।

'কলার কাঁদির কথাটা যেন আমাদের বাড়িতে বলে দেবেন না। সত্যি বলছি, ওটা আপনাদের বাগানের নয়। ও আমাদের নিজেদের বাগানের। আমাদের বাগান থেকে এক রাতে কেটে নিয়ে গিয়েছিল তুলসী আর 'বাজারের' ছেলেরা। আজ আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল সেই কলা খাওয়ার।'

'ও রে! নিজেদের বাগানের কলা চুরি করেছিস?' হাসতে হাসতে আবার তার দম বন্ধ হয়ে আসে। তুলসীর মুখে ততক্ষণে বেশ কথা ফুটেছে। মুখ ধুতে ধুতে বিজ্ঞের মতো বলে, 'উঠোনের ভিতর আবার কামিনী ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে দেখছি।'

'কেন, কামিনী গাছ লাগালে কী হয়?'

'বৃষ্টির পর কামিনী ফুল থেকে পায়খানার গন্ধ বেরোয়।'

'সব শিয়ালের এক রা! আমি এনে শখ করে লাগিয়েছি। বাড়ির মানুষ বলেন, সাপখোপ আসে। গন্ধপাতা বলছে পায়খানার গন্ধ। আর তুই-ই বা বাকি থাকিস কেন? তুইও একটা কিছু বল। ওল কচু মান, তিনই সমান। এ হয়েছে তাই। যার পায়খানার গন্ধ লাগে সে যেন নাক-মুখ বন্ধ করে থাকে।'

পিলে নার্ভাস হয়ে পড়ে। আবার তুলসীটা চটালো বুঝি দেখনঠাকরুনকে! কী দরকার ছিল এত কাণ্ডের পর আবার কামিনী গাছের কথা তোলার! না না, ওঁর মুখখানা তো চটা চটা মনে হচ্ছে না। হাসি হাসি ভাব যেন!...

'এইবার আমার খাওয়া। আমার খাওয়া দেখবি নাকি রে তোরা?'

'ধেৎ!'

পিলেরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

'আচ্ছা, আবার আসিস। কলার কথা কাউকে বলব না। গন্ধপাতা, তুই শুনেছি গান গাইতে জানিস। একদিন শোনাতে হবে কিন্তু।'

'আচ্ছা।'

বাড়ি থেকে সলজ্জ হাসিমুখে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই পিলে বলে, 'ভারি ফাইন কথা বলেন উনি, না রে?'

'একেবারে হাসিয়ে হাসিয়ে মারেন, মাইরি! ওল কচু মান,...শুনলি না? গন্ধপাতা? গন্ধবামুন? এমন সুন্দর করে কথা কেউ বলতে পারে না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—'আমার খাওয়া দেখবি নাকি রে'—তাহলে তাকে ফাইন লাগে—না রে?'

'হ্যাঁ। আর কলার কথা কাউকে বলবেন না। উনি ভয়ংকর আমাদের সাইডে, না রে?'

'ওঁর গায়ে কেমন যেন একটা হিং হিং গন্ধ না রে?'

পিলে জবাব দেয় না। নিজেকে একটু যেন ছোট ছোট মনে হচ্ছে তার। সে তো জানে না গন্ধটা কেমন। তাকে তো উনি অমন করে কাছে টেনে নেননি—তুলসীর মতো। বাবার তেল মাখবার কাপড়ের মতো কোনো গন্ধ হয়তো তুলসী পেয়ে থাকবে। উনি তুলসীকে কাঁদিয়ে ছাড়লেন, কথায় হারিয়ে দিলেন, নতুন নাম দিলেন;—তুব সে চটল না তো ওঁর ওপর। অমন মিষ্টি যাঁর কথা, তাঁর ওপর কি চটে থাকা যায়?...পিলের সবচেয়ে ভালো লেগেছে, আপাতত, আর বরঞ্চ শব্দ দুটি। বাংলার বাইরে তাদের জন্ম। এখানকার কারও মুখে এসব কথা শোনেনি। দেখনঠাকরুনের কথার সুরই আলাদা, ধরনই আলাদা; এখানকার সঙ্গে মেলে না।...খুব ভালো লাগে মাইরি! যে তুলসী, রাজ্যের লোকের নামকরণ করে বেড়ায়, তাকে নতুন নাম দিয়ে দিলেন উনি! দেখনঠাকরুন কি যে-সে লোক! তার ওপর ভয়ংকর আমাদের 'সাইড'-এ; না রে?...

এই দেখনঠাকরুনই পিলেদের নতুনদিদিমা। তিনি ছিলেন ঠিকেদারবাবুর বোধ হয় তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। 'বোধ হয়' এইজন্যে বলা হচ্ছে যে, পাড়ায় এ বিষয়ে দুই রকমের কথা শোনা যেত। পাড়ার সবজান্তার দল বলত যে, ঠিকেদারবাবু প্রথম জীবনে রেলে পয়েন্টসম্যান-এর কাজ করতেন। দর্শনা ইস্টিশানে ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত দর্শনা রেল দুর্ঘটনা সেই সময়েই ঘটে। দায়িত্ব ও ত্রুটি তাঁরই, একথা বুঝতে পেরে গাড়ু হাতে সেই যে পালিয়েছিলেন, আর ও-মুখো হননি। এখানে এসে নাম বদলে নতুন করে জীবন গড়া। আগেকার বউ-এর খোঁজও নাকি

আর কখনো নেননি। ঠিকেদারবাবুর বন্ধুরা কিন্তু এসব কথা আগাগোড়া অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে ঠিকেদারবাবু এখানে এসে যে বিয়ে করেছিলেন, সেই তাঁর প্রথম বিয়ে। তাঁরা একথা বলতেন বটে; কিন্তু মনে একটা খটকা লেগে থাকত এই কারণে যে, ঠিকেদারবাবুর দেশের কোনো আত্মীয়স্বজনের কথা কেউ কোনোদিন তাঁর মুখে শোনেনি; এখানে কেউ কোনোদিন আসেননি। সাত কুলে কেউ নেই এমন লোক কি হয় পৃথিবীতে? যাক গে! এখানে এসে যাঁকে বিয়ে করেন, সে ভাগ্যবতী বছর পনেরো স্বামীর ঘর করে ছেলেমেয়ে রেখে, স্বামীর কোলে মাথা দিয়ে স্বর্গে যান। পিসিমার কাছে সেদিনকার গল্প শুনেছে পিলে।...'হাসপাতালে সেদিন মেরামতের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন ঠিকেদারবাবু। মেম লেডিডাক্তার তাঁর গিন্নীকে দেখে হাসপাতালে ফিরে গিয়ে তাঁকে খুব বকেছে। শুনে ভদ্দরলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। এসেই বসলেন পরিবারের মাথা কোলে নিয়ে। কিন্তু তখন আর তার কোনো সাড় নেই। আগেই বোধ হয় সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ঠিকেদারবাবুর কী ইংরিজিতে কান্না! বুক চাপড়ে মরে! ইংরিজিতে কী সব যেন বলে, আর চোখের জলে বুক ভাসায়।'...

তখন এখানে সবচেয়ে নামডাক হরগোপাল উকিলের—ঐ যে যাঁর বাড়ির গেটে ইংরাজিতে 'রায়বাহাদুর কটেজ' লেখা। একটা নামের মিলের সূত্রে তিনি ঠিকেদারবাবুকে ডাকতেন 'শ্বশুর' বলে। ঠিকেদারবাবু তাঁকে বলতেন 'জামাই'। তাইজন্যে ঠিকেদারবাবুর স্ত্রীকে রায়বাহাদুরের ছেলেমেয়েরা দিদিমা বলত। এর থেকেই তিনি পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের দিদিমা হয়ে যান। ইনি স্বর্গে যাবার মাস-খানেক পর যে নতুন বউ এ বাড়িতে তাঁর জায়গা নিলেন, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে নাম পেয়ে গেলেন নতুনদিদিমা। ঠিকেদারবাবু ছিলেন ভারিক্কি লোক। তবু তাঁকে বন্ধুবান্ধবেরা ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে আবার বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন...'তা কি ঠেকানো যায়? বউ মরার ধাত কিনা ওঁর; তাই একদিন মধু নাপিতকে দিয়ে পায়রা কাটিয়ে, চলে গেলেন বিয়ে করতে।' পিসিমাকে আরও জেরা করলে জানা যায় যে, মন্ত্রপূত পায়রাটি নতুন বউ-এর প্রতীক। সেটাকে মেরে ফেলতে পারলে নতুন বউ-এর মরবার সম্ভাবনা থাকে না। সেইজন্যই না নতুনদিদিমা বউ-মরা-ধাতের স্বামীর পরিবার হয়েও টিকে গেলেন এতকাল।...

স্থানীয় সমাজে ঠিকেদারবাবুর বেশ প্রতিপত্তি ছিল—কতকটা তাঁর রাশভারী স্বভাবের জন্যে, আর বেশিটা তাঁর পয়সার জোরে। কখনো তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নেয়নি এমন লোক পাড়ায় ছিল না। রায়বাহাদুরকে পর্যন্ত তাঁর কাছে হাত পাততে হতো কখনো কখনো। তৃতীয় পক্ষের বিয়ে নিয়ে এমন লোকের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাবার সাহস, তাই এখানকার কারও ছিল না। ঐ পুচকে নোলকপরা

মেয়েটিকে ঠিকেদারবাবুর স্ত্রী বলে মানতে আমরা বাধ্য, কিন্তু তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে রাজি নই—এই দাঁড়িয়ে গেল পুরুষ মানুষদের মনোভাব। পাড়ার গিন্নীবান্নীরা ভাবলেন, অন্য লাইনে। আক্রোশ নয়, অপছন্দও ঠিক বলা চলে না, অথচ এক ধরনের মানসিক বিরোধ ছিল নতুন বউটির বিরুদ্ধে। আগের বউ আপন ছিল, কাজেই ইনি পর। তার ছেলে, তার মেয়ে, তারই নিজে হাতে গড়ে তোলা সংসারের উপছে-পড়া লক্ষ্মীশ্রীর মধ্যে কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসল! 'যে ছেলেমেয়ে দুটোকে ফেলে রেখে সে বউ স্বর্গে গেল, সে দুটোর ওপরও তো দশের একটা কর্তব্য আছে! আছে বললেই আছে! নেই বললেই নেই! সব জিনিসই কি অমনি করে উড়িয়ে দিলে চলে!' সেইজন্যে নতুন বউকে আপন না ভাবা, ছেলেমেয়ে দুটির ওপর পাড়াপড়শির কর্তব্যের একটা অঙ্গ বলে মনে হয়েছিল তাঁদের।

আর নতুন মাকে আপনার লোক বলে নিতে পারেনি ঠিকেদারবাবুর বড় ছেলে তারা।

এ সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রামাণিক খবর পাওয়া যায় নতুনদিদিমার নিজের এখানকার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা থেকে। সে কথা তিনি আজও ভোলেননি।

'মা-বাপে যে গলায় দড়ি বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে তা বোঝবার কি তখন বয়স হয়েছে। আগেকার ছেলেপিলে আছে শুনেছি, কিন্তু ক'টি ছেলে, ক'টি মেয়ে সেসব জানতামও না, জানতেও চাইনি। কীই বা তখন বুঝি! 'এ-বাড়ির-মানুষ'কে দেখে তখন ভয়ে মরি—অত বড় মানুষটা, অত বড় বড় গোঁফ! এদের সংসারে এসে তো ঢুকলাম। সংসার তো আমার সংসারই! ঢুকতেই 'এ-বাড়ির-মানুষ' তারা আর গুটলিকে আমার কাছে এনে বললেন—'এরা যেন কোনোদিন বুঝতে না পারে যে, এদের মা নেই।' প্রথম কথাই হলো এই! দেখো একবার? ভালোভাবে বুঝবার বয়স না হোক, এ তো জেনেই এসেছি। এ হুকুম দেবার দরকার ছিল না। কিন্তু সে কথা বলতে পারিনি তখন অত বড় মানুষটাকে। যত কম বয়সই হোক না কেন আমার, মনে মনে আগে থেকে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, তুল্যের তুল্য করে দিতে হবে এই ছেলেমেয়েদের; দিয়ে দিয়ে, দিয়ে দিয়ে একেবারে নিজের করে নিতে হবে। যাতে কেউ কোনোদিন একটুও ত্রুটি ধরতে না পারে আমার। দেখি, আর ভাবি যে, সে বয়সে আজকালকার মেয়েরা সামলে শাড়িখানা পর্যন্ত পরতে পারে না।...ঐ দেখো না! হাজার দিন বারণ করেছি না!...'

মুখের ভঙ্গি আর চোখের ইশারায় ফ্রক আর ইজারপরা রায়বাহাদুরের নাতনিকে বকুনি দিতেই সে অপ্রস্তুত হয়ে ফাঁক-করা হাঁটু দুটিকে এক করে বসল।

'সুরকিকোটা বুড়ি ভিখুয়ার মা'র কাছ থেকে তো গুটলিকে টেনে কোলে নিলাম! তারাটা আসতেই চায় না কাছে। কত বলি। গোঁজ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাপে বলল 'প্রণাম কর মাকে!' বাপের ভয়ে জুজু। ঢিপ করে সমুখের ঘটিটার কাছে মাথা ঠেকাল। আমি ভাবি ছেলের লজ্জা হয়েছে বুঝি, বড় ছেলে তো। হ্যাঁ, তার বয়স তখন বছর দশেক হবে। বাপ চলে যেতেই, ছেলের লজ্জা ভাঙানোর জন্যে আমি হেসে জিজ্ঞাসা করি, 'হ্যাঁ রে, ঘটিকে প্রণাম করলি নাকি?' তারা বললে, 'মাও যা ঘটিও তাই'। শোনো একবার জবাব! পোড়াকপাল অমন মায়ের! কেঁদে মরি; সেই প্রথম দিন থেকেই। পাড়ার লোকে বিষ করে দিয়েছে ওর মন আমার বিরুদ্ধে। কেন রে বাপু, আমি কী করলাম। তোর বাবা করে এনেছে বিয়ে! মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ভিখুয়ার মা আমার কাছে এসে বলে, 'এই নাও মাইজি লেবু। তোমাদেরই বাগানের। তেতেপুড়ে এসেছ; একটু জলে দিয়ে খেয়ে নাও। তারপর এসব তো আছেই সারা জীবন ধরে। এ কথাটুকু বলারও কোনো লোক নেই এ বাড়িতে! যেমন বরাত নিয়ে এসেছ!' সেদিন ভিখুয়ার মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলাম। কী ভাবলো কী জানি! যত আমি কাঁদি, তত সে কাঁদে, তত কাঁদে গুটলি। ছেলেমানুষ তো গুটলি তখন! তারপর গুটিগুটি একজন দুজন করে উঠোনে ঢুকলেন পাড়ার মেয়েরা, তারার মায়ের গুণের বিন্যাস করতে। না, মিছে বলব না; তখন কীই বা বুঝি, কীই বা জানি; রায়বাহাদুরের গিন্নী সে সময় দিনকয়েক খুব উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে আমার দেখাশোনা করেছিল। রোজ খোঁপা বেঁধে দিয়ে যেত। যার কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছি, তা স্বীকার করব না কেন। তার কাছেই তো প্রথম শিখলাম সেইবার যে, এখানে জ্বরকাটিকে 'থার্মান্টার' বলে।'

কান্নার মধ্যে দিয়ে এখানকার সংসারে ঢুকলে কী হয়, তিনি মানুষটি ছিলেন হাসির। না হেসে কথা বলতে পারেন না। যেমন পারতেন হাসতে, তেমনি পারতেন কথা বলে হাসাতে। হাসিখুশি, গান, রঙ্গতামাশার আবহ তয়ের হয়ে যেত তাঁকে ঘিরে, যেখানে তিনি বসতেন সেখানেই। চেষ্টা করে গান তিনি কোনোদিনই শেখেননি; ঐ শুনে শুনেই যা। আর গান গাইবার সুযোগও মেয়েমানুষের ঘটত ভারি সেকালে! তবে তিনি সুরপাগল লোক ছিলেন। পাড়ায় তখন ঠিকেদারবাবুর বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল না। পাড়ার লোকে দিনের পর দিন 'ধিনতা ধিনা পাকা নোনা' গানের রেকর্ডখানি বাজতে শুনে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠত; কিন্তু নতুনদিদিমার ক্লান্তি আসত না কোনোদিন। রামলীলা, থিয়েটার, হিন্দুস্থানিদের 'যুগীরা'র গান, ধাঙ্গড়দের 'কর্মাধর্মা'র নাচগান, মহরমের লাঠিখেলা, 'ছটপরবের পিদিম ভাসানো', রাজা সিংহাসনে বসবার মিছিল, বাড়ির উঠোনে মেয়েদের চড়ুইভাই, সব জিনিসে ছিল তার সমান উৎসাহ। পাড়ার গিন্নীবান্নীদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি চেষ্টা করতেন ভারিক্কি হবার; কিন্তু যার চোখ আছে সে-ই বুঝত যে এ শুধু তার বুঝেসুঝে চলবার প্রয়াস। তাই থসথসে বুড়িরা দুজন একত্র হলেই একবার অবাক হয়ে নিতেন—'কী হুজুগেই নাচতে পারে ঠিকেদারের নতুনবউ!'

এই কথার পিছনে বোধ হয় উহ্য থাকত—'অনেক খোয়ার আছে ঠিকেদারের কপালে...যেমন গিয়েছিল...!'

পাড়ার ছেলেমেয়েরা কিন্তু নতুনদিদিমাকে ভালোবেসেছিল প্রথম থেকেই। তাদের কাছে তিনি হয়ে যেতেন বয়সের চেয়েও ছোট। এ তাঁকে চেষ্টা করে হতে হতো না, কারণ এই হচ্ছেন আসল নতুনদিদিমা। বাড়ির উঠোনে এক্কাদোক্কা খেলা থেকেই এ জিনিসের আরম্ভ। তারার মনের নাগাল তিনি পাননি। তাই বোধ হয় গুটলিকে বেশি করে টানতে চেয়েছিলেন, এই সব করে। 'বাড়ির-মানুষ' সাধারণত সন্ধ্যার আগে বাড়ি আসতেন না। সন্ধ্যার পর থেকে আরম্ভ হয়ে যেত হিসাবনিকাশ, মিস্ত্রি-মজুরদের মজুরি দেওয়া, জিনিসপত্র গুনে-গেঁথে তোলানো—আরও অনেক রকম আনুষঙ্গিক কাজ। প্রথম যেদিন হঠাৎ অসময়ে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে, পাড়ার ছেলেমেয়ের সঙ্গে নতুনবউকে এক্কাদোক্কা খেলতে দেখেন, তখন কেশে তাকে সময় দিয়েছিলেন সামলে নেবার জন্য। নতুনবউ অপ্রস্তুত হয়ে মাথার কাপড় টেনে দিয়েছিলেন। ছেলেপিলেরা মুহূর্তের জন্যে থমকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল;—অন্যায় করতে গিয়ে যেন ধরা পড়েছে সকলে। 'বাড়ির-মানুষ' মুহূর্তের জন্যে কী ভাবলেন তিনিই জানেন।

'তোরা সব খেলা বন্ধ করলি কেন? কি গো খুদে চাটুজ্যে, দিদির কোলে চড়ে খেলতে আসা হয়েছে। অত করে চুষলে বুড়ো আঙুলটা আর থাকবে না।'

বারান্দার ওপর তারার বন্ধুরা ফুটবল পাম্প করছিল। ইনফ্লাটারটি তারার। সে নিজের অধিকার সম্বন্ধে খুব সজাগ। তাই এখানে এসেই বল পাম্প করতে হয় বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেদের। ঠিকেদারবাবুকে দেখেই ছেলেরা স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ইনফ্লাটারটা লুকিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো বসে ছিল। বারান্দার ওপর দিয়ে ঘরে ঢুকবার সময়, তিনি তারাদের দলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে গেলেন 'সব একেবারে সাধুঃ সাধুঃ সাধবঃ।' ঠিকাদারবাবু আজ অন্য মানুষ! তারার বাবার আজ হলো কী? ভয়ে যাঁর কাছে কোনোদিন সরস্বতী পুজোর চাঁদা পর্যন্ত চাইতে যাওয়া হয় না। তিনি তাহলে হাসিমস্করাও জানেন। একটা সংক্রামক হাসির গুঞ্জনে সারা উঠোন মুখর হয়ে ওঠে।

ঠিকেদারবাবু যেন হঠাৎ উপলব্ধি করলেন তাঁদের দুজনের বয়সের তফাতটা। তেত্রিশ বছরের পার্থক্য দুজনের বয়সে! তাঁর চোখ দিয়ে কি নতুনবউকে এই জগৎটা দেখাতে বাধ্য করা ঠিক হবে? নিজের মনের মধ্যে সংস্কারের বিরোধটুকুকে দূর করে দিতে চেয়েছিলেন হালকা হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে। এই ছাড়পত্র দেবার মধ্যে অন্য কোনো হিসাব ছিল না। তরুণী ভার্যার প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতাজনিত আচরণও এ নয়। হঠাৎ বুঝবার ঝলকে চোখে ফুটে উঠেছিল একটা নিবিড় কোলমতা যা নতুনবউ-এর নজর এড়ায়নি।...বাপের বাড়িতে একবার একটা